বৃত্তের বাইরে চিত্তপ্রসাদ

রতন শিকদার

সময়ের কাজ সময়ে না হওয়াতেই যত গন্ডগোল। ভট্টাচার্য মশাইদের কপালটাই এমন। ওর জীবন - ঘড়িটা লেটে চলেছে বরাবর। তাই প্রতি পদক্ষেপেই সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারার জন্য ঠেকতে হয়েছে বরাবর। আর সেই ঠেক খাবার ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে এখনও।

বড় ছেলে সত্যপ্রসাদ। সে চাকরিতে থিতু হয়ে বসতে না বসতেই তার বিয়ে দিয়েছিলেন তারক ভট্টাচার্য। বড় ঘরেরমেয়ে এনেছিলেন। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই নাতির মুখ দেখেছিলেন। তার যজমানি আয় উপার্জনের জোড়াতালি দেওয়া সংসারটায় সে সময় বেশ চাকচিক্য। নাতির অন্নপ্রাশন করালেন বেশ জাঁকজমক করে। নাতির অন্নপ্রাশনের ঝক্কি - ঝামেলা মিটে যেতেই বৌমা বেঁকে বসল। তার আরশ্বশুর - শাশুড়ির সংসারটা পছন্দ হচ্ছিল না। কিছুদিনের মধ্যেই তারা আলাদা সংসার পাতলো।

বড়ছেলের আলাদা সংসার মানে তারক ভট্টাচার্যের সংসারে মূলধনে ঘাটতি। এক যজমানের থেকে দান সূত্রে পাওয়া বিঘা চারেক জমির ফসলই প্রধান ভরসা। সেই জমিতে এখন পাকা ধান। অসময়ের ঝড়বৃষ্টিতে সে পাকাধানের শীষ এখন প্রায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। লোক লাগিয়ে সে ধান কাটিয়ে ঘরে তুলতে না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু কে করে এ সবের তদারকি। মেজ ছেলে নিত্যপ্রসাদই এতকাল এ সব দেখাশোনা করত। জমিজমা, ফসল এসব তারই তত্ত্বাবধানে সামলাতেন তারক ভট্টাচার্য। সেই ছেলে গত বছর বি এ পাশ করেছে। তারপর থেকেই তার আর চাষবাসে মন বসে না। এই মুহূর্তে তারক ভট্টাচার্যের ভরসা কেবল ওই ছোট ছেলে চিতু অর্থাৎ চিত্তপ্রসাদের উপরে।
চিত্তপ্রসাদ তার বাবা মায়ের নবম সন্তান। সবে উনিশে পা দিয়েছে। গত ফাল্গুনে। এখানেও একটু সময়ের গোলমাল করে ফেলেছিলেন তারক ভট্টাচার্য। চিতুর যখন জন্ম হয় তখন তিনি পঞ্চান্নর গন্ডি পেরিয়ে গেছেন। ওই বয়সে নবম সন্তানের জনক হয়ে তিনি যে বেশ খুশি হয়েছিলেন তার প্রকাশ তার পুত্রের নামকরণেই বোঝা যায়। তবে খানিক লজ্জাও হয়েছিল তার। তাই কনিষ্ঠ সন্তানের অন্নপ্রাশনে কোনও অনুষ্ঠান হয়নি। গৃহ দেবতার অন্নপ্রসাদেই চিত্তপ্রসাদ প্রথম অন্নের স্বাদ পেয়েছিল। অসময়ের ফল ফলাদির কদর বেশি। চিতুর প্রতি সত্যপ্রসাদের বিশেষ টান। প্রত্যাশাও অনেক। ওর বিশ্বাস সে অন্য দুটোর মত হবে না। তার বোঝাটা চিত্তপ্রসাদ নিশ্চয়ই একদিন কাঁধে তুলে নেবে।

চিত্তপ্রসাদ এখন কলেজে পড়ছে। তার অনেক পড়ার ইচ্ছা। পড়াশুনা করে বিদ্বান হয়ে সে মাস্টারি করবে। বাপ - দাদার সাথে জমিজিরেতে টুকটাক কাজ সে সব সময়ই করেছে। তবে এ সবে তার উৎসাহ বিশেষ নেই। বাবার অবাধ্য হতে সে পারে না। তাই ভাল না লাগলেও ওসব কাজে সে হাত লাগায়।। ভট্টাচার্য মশায় এসব বোঝেন। তবুও ভাবেন যজমানির কাজটা তো ধরতে পারে চিতু। তাতেও তো বুড়ো বাপটার খানিকটা সুরাহা হয়। ছেলেবেলায় সেঅবশ্য জেদ ধরত বাবার সাথে যজমানি বাড়ি যাওয়ার। গাইঘাটার সরকারের বাড়িতে। সে ওই বছরে, একবার, দুর্গাপূজার সময়ে। তার বাবা যখন ছোড়দাকে নিয়ে পূজার্চনায় ব্যস্ত থাকতেন, সে তখন ও বাড়ির ছেলেমেয়েদের সাথে মাঠেঘাটে, বনে-বাদাড়ে নদীর পাড়ে, কাশের বনে ঘুরে বেড়াত। পূজার আকর্ষণ তার কাছে গৌণ। তবুও সে যেত, কারণ নতুন জায়গা, নতুন সাঙ্গী- সাথি। সব মিলিয়ে শুধুই মজা আর মজা।

ছোটবেলা বেলা থেকে চিতু কেমন যেন উদাস প্রকৃতির। ছেলেবেলায় ওর বয়সী আর সবাই যখন গোল্লাছুট, দাড়িয়া বন্দা ইত্যাদি খেলায় মেতে থাকত, চিতু তখন একা একা পুকুর পাড়ে বসে জল ফড়িং -এর সাঁতার কাটা দেখত। জলের মধ্যে বুড় বুড়ি কাটা দেখেও চিনত কোনটা মাছ আর কোনটা কাঁকড়ার বুড়বুড়ি। পুকুরের ওই পাড়ে কলাগাছের মাথায় যখন অস্তগামী সূর্যের লাল আভা ছড়িয়ে পড়ত চিতু তখন আনমনে সে রঙের খেলায় মেতে থাকত। ওর মনে প্রশ্ন উঠতে রোজ রোজ সূর্যটা ডুবে যাবার আগে অমন নতুন নতুন শোভা সৃষ্টি হয় কী করে। ওর উদাসী মন এ সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়াত।

চিত্তপ্রসাদ যখন প্রাইমারিতে পড়ে তখন তার সবচেয়ে প্রিয় ঠাকুর রবি ঠাকুর। পঁচিশে বৈশাখ রবি ঠাকুরের ছবিতে মালা দিয়ে সাজাত। আর এসব ব্যাপারে তাকে সব চাইতে বেশি উৎসাহ যোগাত তার ছোড়দি। ছোড়দি ঝুমুর তার থেকে বছর দুয়েক বড়। কিন্তু হাবেভাবে চিরদিনই যেন পাকাবুড়ি। প্রতিপদে চিতুকে আগলে রাখা, শাসন করা সব দায় যেন তারই। এই উনিশ বছর বয়সের চিতুকেও সে সব বিষয়ে পরামর্শ দেবে। আর চিতুও তার ছোড়দি অন্তপ্রাণ। বাবা ছোড়দির জন্য পাত্র খুঁজছেন। ছোড়দির বিয়ে হয়ে গেলে চিতু একা হয়ে যাবে।

বাবার মতে সায় দিয়ে চিত্তপ্রসাদ ইদানিং একটু একটু যজমানির কাজ করছে। তবে এসবেতে তার মন বসে না। এ সব পূজাপাঠে তার মন ঠিক সায় দেয় না। বেশ কয়েকবার চিতুর মা তাকে দিয়ে গৃহদেবতা নারায়ণের সেবা করাতে গিয়ে বেশ অস্বস্তিতে পড়েছেন। একবার তো চিতু তার মাকে বলেই দিল, 'তোমার নারায়ণ শিলার ক্ষিদে তেষ্টা লাগে কী করে বুঝি না বাবা। তোমার ঠাকুর যদি সাতদিন একনাগাড়ে ফুল- বেলপাতা নাও পান তবে কেঁদে কঁকিয়ে তোমাকে জানান দেবেন না, বুঝলে?' তার মা এ কথার কী উত্তর দেবেন বুঝে পান নি। শুধু বলেছেন, 'বাবা, তুই বামনের ছেলে। পূজাআর্চা তো তোকে মানতেই হবে। লোকে তো তোর বাবাকে দিয়ে তাদের দেবতার পূজা করিয়ে শান্তি পায়। তার তাদের এই পূজাআর্চা আছে বলেই না আমাদের সবার খাওয়া-পরা, তোর লেখাপড়া এ সবেরই যোগান কষ্টেসৃষ্টে হয়ে যাচ্ছে।' কথাগুলো শুনতে সেদিন চিতুর ভাল লাগেনি। কিন্তু প্রতিবাদও সে করতে পারে নি। যা নিদাণ সত্য তাকে সে অস্বীকার করে কী করে। সে তো জানে তার দাদা আলাদা সংসার পাতবার পর মাস গেলে নগদ পয়সার অভাবটা কেমন বোধ হচ্ছে। এ সব রূঢ় সত্য সে তো খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করছে।

এক বছরও হয় নি চিতুর পূজার কাজে হাতেখড়ি হয়েছে। গতবছর দুর্গাপূজায়, গাইঘাটার সরকার বাড়িতে। সে তার বাবার সহকারী হয়ে কাজ করেছে সেখানে। প্রণামীর থালায় যা টাকা পয়সা পড়েছিল তার সবই তারক ভট্টাচার্য তার ছেলের হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, 'বাবা, ওগুলো ঠাকুরের দান। ও সব তোমারই প্রাপ্য। ও দিয়ে তুমি তোমার কলেজের পড়াশুনার খরচ চালিও। তারপর লক্ষীপূজা, কালীপূজা, কার্তিক পূজা এ সব তো গৃহস্থ বাড়িতে লেগেই আছে। কটা পূজা করলে তোমার সারা বছরের খরচ তুমি নিজেই চালিয়ে নিতে পারবে।'

চিতু ভাবে, সত্যিই তাই। তার কলেজের বইপত্র, যাতায়াতের খরচ - অনেক টাকার দরকার। আর কোনও উপায় নেই বলে তার বাবাও এই বৃদ্ধ বয়সে যজমানির কাজ করেন। কিন্তু সে তো নিজের মন থেকে সাড়া পায় না --এ যজমানির কাজে তা সত্ত্বেও সে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ছে এই যজমানির গন্ডির মধ্যে। যজমানিকে পেশা করে অর্থ উপার্জন করতে হচ্ছে। সে তো বাধ্য হয়েই এক ধরণের অভিনয় করে চলেছে। ধুতি পরে, নামাবলী গায়ে চড়িয়ে সে যাকরছে তা তো নাটকের চরিত্রাভিনয় ছাড়া কিছু নয়। সে কি ওভাবে ও অন্যকে নিরন্তর ঠকিয়ে যাচ্ছে না। এক একটা রঙ্গমঞ্চ। এক এক পূজার এক এক রকম মন্ত্রোচচারণ। এ সবই পেশাদার অভিনেতার মত পরিবেশ পরিস্থিতি নাটকের চরিত্র প্রভৃতির সাথে মিলিয়ে দর্শকের চাহিদা মত অভিনয় করে যাওয়া। কিন্তু বাস্তবকে অস্বীকার করবে কীভাবে? তার পূজাকর্মে তো গৃহস্থরা বেশ খুশি হন বলেই মনে হয়। তারা বলে, 'বড় ঠাকুরও আজকাল এমন সুন্দর করেপূজাপাঠ করতে পারেন না।' চিতু ভাবে অন্যরকম। তার বাবা হয়ত ইচ্ছা করেই এমন করেন। উনি হয়ত ধীরে ধীরে চিতুকে তার নিজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করে দিতে চান। যজমানরা স্তুতি করে তার। চিতু লজ্জা পায়। ওর গৌরবর্ণ মুখমন্ডলে লজ্জার লালিমা আঁকা হয়ে যায়। মাটির দিকে তাকিয়ে প্রণামীর থালা থেকে টাকা পয়সা তুলে নিয়ে দ্রুত কোমরের ধুতির খুঁটে গুঁজে ফেলে একছুটে বেরিয়ে আসে যজমানের বাড়ি থেকে। সে নিজের হাতে গামছায় বেঁধে ভোজ্য সামগ্রী বাড়ি বয়ে আনতে পারে না। চিতুর লজ্জা লাগে। চিতু ওই বৃত্তের গন্ডির মধ্যে বাঁধা পড়তে চায় না।

এখন বড়দিনের ছুটি চলছে চিতুর কলেজে। বাড়িতে তার এখন কত কাজ। শ্যামলীর বাচচা হয়েছে। এবার শীত পড়েছে জাঁকিয়ে। চিতু তার এই ছোট্ট জীবনে এমন শীত দেখেনি কোনদিন। কদিন আগের ঝড়ে তাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। গোয়াল ঘরের বেড়াটা এক জায়গায় ভেঙ্গে পড়েছে। বেড়ার ওই ফাঁকটা দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া ঢুকে গোয়াল ঘরের অবলা জীবগুলোকে খুবই কষ্ট দিচ্ছে। চিতু অনুভব করতে পারে শ্যামলীর ওই বাছুরটার কী কষ্টই না হচ্ছে। ও সারাটা সকাল লেগে রইল গোয়াল ঘরের বেড়া মেরামতিতে। নিজের হাতে একটা ছেঁড়া বস্তা টাঙ্গিয়ে শেষ পর্যন্ত বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া আসা আটকাবার ব্যবস্থা করল সে। এ সব কাজে তার দাণ উৎসাহ। কারওআদেশ-নির্দেশের অপেক্ষা করে নি সে। ও দিকে উঠানের শিউলি গাছটার একটা ডাল ভেঙ্গে পড়েছে। গাছটার ওই বিশ্রী ক্ষতটাকে সে সুন্দরভাবে ছেঁটে পরিচর্যা করেছে। এই শিউলি গাছটার পরিচর্যা করতে গিয়ে ওর শরৎকালের কথা মনে পড়ে। প্রতিবছর শরতের আগমন আর সবার মত সেও টের পায় ওই গাছটায় ফুল ফুটতে দেখে। পুরো চত্বরটা

ফুলের গন্ধে মেতে ওঠে। ওই ফুলের গন্ধে ও কেমন যেন উদাস হয়ে যায়, বুকের ঠিক মাঝখানটায় মোচড় দিয়ে ওঠে। ব্যথায় যেন টন টন করে। একটু বড় হবার পর থেকে প্রতিবছর ঠিক ওই সময় সেই ব্যথাটা ও অনুভব করে। কারণটা যে কী তা সে নিজেও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তবে এই অনুভূতিটা আর একটা অনুভূতির জন্ম দেয়। ত া হল শীতের আগমনের জানান দেওয়া একটা অনুভূতি। শীত মানেই বিষন্ন বিকাল। শীত মানেই প্রকৃতির ক্ষতা। সব গাছগাছালি অনাবশ্যক শারীরিক মেদের মত পাতা ঝরিয়ে নির্বিকল্প সন্ন্যাসীদের মত দাঁড়িয়ে থাকবে। প্রকৃতির ওই শুষ্কতা চিতুর মনের গভীরে কেমন একটা আর্দ্রভাব সৃষ্টি করে আর চিতু খুব কষ্ট বোধ করে।

গত রাতেও এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। ঠান্ডার কামড়টা বেশ জোর। চিতুদের বাড়ির চারপাশের গাছপালা ভেদ করে ভোরের সূর্যের আলো এসে পৌঁছায় নি এখনও। উত্তর ভিটের ঘরটাতে পৌঁছায় আরও পরে। ওই ঘরটায় চিতু শোয়। বড়দা বাড়ি ছেড়ে যাবার পর ঘরটা তার দখলে এসেছে। সাবালক চিতু এখন আলাদা একটা ঘরে থাকে। একাঘরে লেপ মুড়ি দিয়ে সে শুয়ে আছে। চিতু পাশ ফিরে শুল। জানালা দিয়ে যেটুকু আলো আসছে তাও যে ওর ঘুমেরকোন ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে। বাদ সাধল তার ছোড়দি। পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে মাথার ওপর থেকে লেপটা সরিয়েদিল। তারপর ডান হাতে করে আঙ্গুল দিয়ে ওর গোঁফের হালকা রেখাটার ওপর সুড়সুড়ি দিতে লাগল। চোখ না খুলেও চিতু বুঝতে পারে এ তার ছোড়দির কাজ। ছোড়দির হাতটা জোর করে সরিয়ে দিয়ে শ ামুকের খোলের মধ্যে চটকরে ঢোকার মত লেপের নীচে নিজেকে গুটিয়ে ফেলল। তারপর পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। এবারে ঝুমুর গল াছেড়ে ডাকে, 'চিতু উঠে পড় এক্ষুনি। তোর না আজ বাবার সাথে যাবার কথা। বাবা কখন উঠে পড়েছেন। ওঠ্, ওঠবলছি। আর দেরি করলে বাবা খুব রেগে যাবেন কিন্তু।'

অগত্যা চিতুকে উঠতেই হয়। একে শীতে বিছানা ছাড়বার কষ্ট। তার ওপর আবার সেই বিরক্তিকর অভিনয় করতে যেতে হবে বাবার সাথে, নীলগঞ্জে। শ্রাদ্ধের কাজ। সে কোনওদিন শ্রাদ্ধের কাজ করেনি। সে না কী ভারি কঠিন কাজ। তবে রক্ষে এই যে তাকে শুধু গীত া পাঠ করতে হবে। খুব সুন্দর করে। শুদ্ধ উচচারণ করে।

খুব জাঁকজমক করে ষোড়শোপচারে শ্রাদ্ধের আয়োজন। চিতু তার বাবার নিষ্ঠাসহকারে শ্রাদ্ধকর্মের ক্রিয়াকলাপ দেখতে দেখতে ক্ল ান্ত হয়ে পড়ে। দুপুর গড়িয়ে যাবার পর তার গীতাপাঠ শু হয়। সকাল থেকে উপোসী। চোখমুখতার শুকিয়ে এসেছে। তবে এরই মধ্যে মৃতার এক কন্যা তাকে বার দু'য়েক সরবৎ খাইয়ে গেছেন। প্রায় জোর করেই। মহিলাটি ঠিক ওর বড়দির মত। স্নেহের ডাকে এমন আপন করে নিয়েছেন যে ভাল না লাগলেও তার কথা চিতু ফেলতে পারেনি। চিতু অষ্টাদশ অধ্যায়টি যখন পাঠ শেষ করল তখন বেলা বাজে দুটো। এতক্ষন পাঠে এত মগ্ন ছিল যে শ্রোতাদের দিকে চোখ ফেরাবার কোনও অবকাশ পায়নি। পাঠ শেষে প্রণাম সেরে গীতাখানা জলচৌকির ওপর রেখে চিত্তপ্রসাদ এবার চারপাশে তার দৃষ্টিটাকে ঘুরিয়ে নেয়। ওর নজর পড়ে ওই বড়দির মত মহিলাটির দিকে। তার চোখ দুটি চিক চিক করছে। অন্যান্য পুষ ও মহিলারাও যেন তার গীতাপাঠে মুগ্ধ হয়ে তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন। চিতু ভাবে তার চরিত্রাভিনয় নিশ্চয়ই সার্থক। সবাই নিশ্চয়ই পরিতৃপ্ত। সবাই যদি তৃপ্ত হয় তবে সেও খুশি মনে মনে চিতু বোধহয় মৃতার আত্মারও শান্তি কামনা করে।

ওই বড়দির মত মহিলাটি সবার আগে কথা বলেন, 'বাবা জানি তুমি খুব ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। তবুও তোমাকে একটা
অনুরোধ করব সবার তরফে। আমরা সবাই খুশি হব যদি তুমি আরও একটু কষ্ট কর আমাদের জন্য। তুমি সহজ ভাষায় গীতা মাহ াত্ম্য একবার আমাদের শোনাও। তোমার গীতাপাঠ অপূর্ব হয়েছে।'

এবার চিতু লজ্জায় পড়ে। ওর শুকনো মুখখানাতে একটু লালচে আভা ছড়িয়ে পড়ে। আড়চোখে সে বাবার দিকে তকায়। তার বাব ার চোখমুখ উজ্জ্বল। ছেলের প্রশংসা শুনে তিনি নিশ্চয়ই খুব আনন্দিত। বোধ হয় খানিক নিশ্চিন্তও । আত্মতৃপ্তি ওকে পেয়ে বসে। চিতু তার সত্যিকারের উত্তরাধিকারী হতে চলেছে। ছেলে বুঝি তার সম্মতি চায় তিনি বলেন, 'তুমি তো একাজে অপাবগ নও। তুমি তো সম্পূর্ণ শিক্ষণপ্রাপ্ত। তোম অধীত বিদ্যাপ্রয়োগের এই তো উপযুক্ত ক্ষণ। তবে আর দ্বিধা কেন? তোমা আশুকর্তব্য এদেরকে খুশি করা। এদের তৃপ্তি মানে মৃতার আত্মার শান্তি।'

চিত্তপ্রসাদ আর কালক্ষেপ করে না। সহজ সরল বাংলায় গীতা মাহাত্ম্য বলে যেতে শু করল। ওর সামনে রাখা থালাটা গীতাপাঠ শ্রোতাদের দেওয়া দক্ষিণায় ভরে উঠল। পাঠ শেষে মহিলা ওকে দোতালায় ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরের মেঝেতে আসন পাতা। তার

সামনে পাথরের থালায় একরাশ লুচি তরকারি আর এক থালায় দই মিষ্টি। বললেন,'তুমি সকাল থেকে উপোসী রয়েছ, এবার খেয়ে নাও। আমার দাদারা তোমার বাবার যত্নঅত্তি করছেন।'

চিতু খাওয়া শু করে। মহিলা সামনে বসে হাত পাখা দিয়ে বাতাস করতে থাকনে। মাঝে মধ্যে রেডিও'র অনুষ্ঠানের মাঝে ঢুকিয়ে দেওয়া ফিলারের মত টুকরো টুকরো কথা। চিতু খাওয়া সেরে উঠতেই হাত ধোওয়ার জল এগিয়ে দেন তিনি। চিতু সঙ্কোচে একেব ারে গুটিয়ে যায়। বলে, 'আপনি আমার বড়দির মত। বয়সে আমার থেকে অনেক বড়। আমাকে পাপের ভাগী করবেন না। অমন করে সেবা করলে যে আমার পাপ হবে।'

মহিলাটি হেসে ফেললেন। বললেন, 'পাপপুণ্য তো যার যার নিজের মনের কাছে। একটু আগে গীতা মাহাত্ম্য শোনাতে গিয়ে তুমি বললে, শ্রদ্ধাসহকারে অসূয়াবিহীন হয়ে যে গীতাপাঠ শ্রবণ করে সে শুভলোক প্রাপ্ত হয়। তবে কী জান ভাই, আমি এই ইহলোকেই ঝিাস করি। আমার মায়ের শ্রাদ্ধে এত জাঁকজমক হল। দাদারা কত খরচাপাতি করল। কিন্তু মা বেঁচে থাকতে এরা তাঁর সুখ শান্তির জন্য কী করেছে তা আমি জানি। এখন এসবে কী হবে? মার আত্মা শান্তি পাবে? বেঁচে থাকতে তো শান্তি পায়নি। এটাই তো বাস্তব সত্য, তাই না ?'

এ সবের উত্তর চিত্তপ্রসাদের অজানা। তারর মনেও তো একই দ্বন্দ্ব । মন থেকে সায় না থাকলেও সে তো তার বাবার আজ্ঞামত পূজ াপাঠের কাজ করছে। আর তার ফলেই তার বাবার কষ্ট তো খানিকটা লাঘব হচ্ছে। তার কাছে এ সব যজমানির কাজ নিছক অভিনয়ের মত লাগে নিশ্চয়, তবে এর একটা বাস্তব ফল তো সে পাচ্ছে প্রতি পদে। এই পাওয়ার মধ্যে তো কোনও মিথ্যা নেই। সবট াই তো বস্তুভিত্তিক। এর মধ্যে তো কোন অনুভবের ব্যাপার নেই। সবই তো সে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে ভোগ করছে।

বেলা পড়ে এল। তারক ভট্টাচার্য তার পুত্রকে নিয়ে পথে নামলেন। শ্রাদ্ধের বিপুল দান সামগ্রী ওরা পরে সময় করে তার বাড়ি পৌঁছে দেবেন। চিত্তপ্রসাদ আর তার বাবা দুজনের কাঁধেই দুটো ঝুলি। চিতুর কাঁধের ঝুলিটা একটু বেশি ভারি। চিতু এমনিতেই তার বাবার সাথে খুব কম কথা বলে। আজ যেন সে একটু বেশি গম্ভীর, পশ্চিম আকাশে হঠাৎ উঠে আসা বিশাল কালো মেঘটার মত। মনে হচ্ছে একটু পরেই আকাশটা বুঝি ভেঙ্গে পড়বে। এক পশলা জোর বৃষ্টি হবে। ওদের দুজনের পায়ে প্রায় ছুটে চলার গতি। বিশ াল একটা প্রান্তর সামনে। এই প্রান্তরটা তাদের অতিত্রম করতে হবে। বৃষ্টি আসন্ন। বৃষ্টির আগেই ওই প্রান্তর পেরিয়ে স্টেশনে পৌঁছতে হবে ওদের। ওই স্টেশন থেকেও প্রায় কুড়ি মাইলের পথ ওদের বাড়ি।

তারক ভট্টাচার্যের মাথায় আরেক চিন্তা। এই অসময়ের বারবার বৃষ্টিতে ক্ষেতের ফসলগুলো নষ্ট হলে সারা বছর তার জের চলবে। এ সব বাস্তব সত্য -- চিত্তপ্রসাদ খুব ভাল করেই বোঝে। তার মনেও এ সব ভাবনা একের পর এক সার বেঁধে আসতে থাকে। তার মা এতক্ষুণ তুলসিতলায় সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে। আসন্ন ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কায় সন্ধ্যা নামবার একটু আগেই আজ প্রদীপ জ্বলছে। ত ারপর মা আর ছোড়দি নিশ্চয়ই তাদের বাড়ি ফেরার অপেক্ষায়পথ চেয়ে বসে আছে। অনেক আশা নিয়ে বসে আছে। বড়লোক যজমানের বাড়ির কাজ। দান সামগ্রীও নিশ্চয়ই অনেক পাওয়া গিয়েছে। ছোট ছবিগুলোতে রং-এর বড় অভাব। এখন মেঘটার রং খ ানিকটা ধূসর হয়ে এসেছে। ওই ধূসর মলিন রং চিত্তপ্রসাদের আঁকা ছবিগুলোতে।

বিশাল প্রান্তরের রং সবুজ। তার মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা পথ বেয়ে চলেছে চিত্তপ্রসাদ আর তার বাবা। পথটা যেন অনেক, দীর্ঘ মনে হয় চিত্তপ্রসাদের দূরদিগন্তে এক বলয় রেখে ওই ঝুলিটা ও বইতে পারে না। ওটাকে পথের মধ্যে ফেলে দিয়ে চিত্তপ্রসাদ দৌড়তে থ াকে কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তারক ভট্টাচার্য ওকে ধরে ফেলেন। ওকে জাপটে ধরেন। পথের মধ্যে ফেলে আসা ঝুলিটা আবার ওর কাঁধে চাপিয়ে দেন। চারিদিকে কেমন একটা যেন আঁধার নেমে এল আস্তে আস্তে। চিত্তপ্রসাদ হাঁটছে। সামনে তারক ভট্টাচার্য। দু'টি ম ানুষ হাঁটছে একটু আগে একটু পিছে।